কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ বাজার ব্যবস্থা ও তার নিয়ন্ত্রণ

শ্রীমনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কৌটিল্যের সময় দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুতকৃত প্রায় সমস্ত পণ্যের উপর কর বসানো হইত। আবার বিদেশে রপ্তানিকৃত দ্রব্য এবং বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপরও হয় মূল্যানুপাতে, না হয় দ্রব্যের একক-প্রতি কর আরোপ করা হইত। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে অনুসৃত কর কাঠামো ও পদ্ধতির সাথে কৌটিল্যের কর আরোপ পদ্ধতির অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের মিল আছে। কৌটিল্যের সময় সাধারণত পণ্যের প্রকৃতি অনুসারে কর আরোপ করা হইত। ঐ সময় আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের ১/৫ অংশ কর হিসাবে আদায় করা হইত। আবার ফল, শাকসব্জি, বীজ, শুকনা মাছ, শুকনা মাংস ইত্যাদি ধরনের পচনশীল দ্রব্যের মূল্যের ১/৬ অংশ কর হিসাবে আদায় করা প্রচলিত নিয়ম ছিল। অন্যদিকে দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান ধাতুর উপর কর আরোপের ব্যাপারে ধাতু বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হইত।

আগেই বলা হইয়াছে যে কৌটিল্য একটি কল্যাণ-কামী রাষ্ট্র ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে জনগণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নমনীয় নীতি প্রদর্শনের সুপারিশ করেন। তাঁহার সময়ে সূতী বস্ত্র, সিল্ক, লৌহ, পাদুকা, চামড়া, গার্মেন্টস্ দ্রব্য প্রস্তুতের কাঁচামাল, কার্পেট, পশমী বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের ১/১৫ অংশ হইতে ১/১০ অংশ পর্যন্ত কর আরোপ করা হইত। আবার জনগণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর আরও কম হারে কর আরোপের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন। যেমন তুলা, বস্ত্র, ঔষধ, বাঁশ, খাবার তৈল, চিনি, লবণ এবং অপরাপর এই ধরনের দ্রব্যের উপর উহাদের মূল্যের মাত্র ১/২০ অংশ হইতে ১/২৫ অংশ কর আরোপের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে যে সব দ্রব্য সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক সে সব দ্রব্যের উপর কোন প্রকার কর না আরোপের পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন পণ্যের উপর কৌটিল্যের সুপারিশকৃত কর হার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি সমাজের প্রয়োজনীয়তার মাত্রানুসারে কর হার নির্ধারণেয় সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ একদিকে কল্যাণকামী রাষ্ট্রীয় ধারণার সাথে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি অন্যদিকে ইহা আধুনিক যুগের কথিত প্রগতিশীল কর কাঠামোকে প্রতিফলিত করে। কেননা বিলাস জাতীয় দ্রব্যের উপর বেশী হারে কর আরোপ এবং উহার পাশাপাশি সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর নিম্ন হারে কর আরোপ ও নির্বাচিত দ্রব্যের উপর কর আরোপ না করা, ইত্যাদি সামগ্রিক অর্থে একটা প্রগতিশীল কর কাঠামো ব্যবস্থার সাথে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে চার হাজার বছর পূর্বে কিভাবে কৌটিল্য দ্রব্যের শ্রেণী অনুযায়ী একটি সংগতিপূর্ণ কর কাঠামোর কথা চিন্তা করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে অর্থনীতিবিদসহ কর নীতির নির্ধারকগণ স্বীকার করেন যে করের হার দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কর হার নির্ধারণের বেলায় দুইটি স্থিতিস্থাপকতা গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। চার হাজার বছর পূর্বে কৌটিল্যও কর কাঠামো নির্ধারণের সময় এই দুইটি স্থিতিস্থাপকতার উপর গুরুত্ব

আরোপ করেন। অথচ রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা (Public Finance) সম্পর্কে আধুনিক ব্যাখ্যার বয়স এক শতাব্দীও হয় নাই। কৌটিল্যের সময় পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং বিবেচ্য পণ্য সমাজের জন্য কতটুকু প্রয়োজন তাহার মাত্রা বিবেচনা করিয়া করের হার নির্ধারণ করা হইত। যে-সব দ্রব্য পচনশীল, সেগুলির যোগান সাধারণত অস্থিতিস্থাপক। তৎকালীন সময়ে পচনশীল দ্রব্য, মূল্যবান এবং সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ক্রমহ্রাসমান হারে কর বসানো হইত। অন্যদিকে বিলাস জাতীয় এবং সামাজিক ভাবে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর বেশী হারে কর আরোপ করা হইত। এইভাবে কৌটিল্যের অর্থ ব্যবস্থায় আনুপাতিক, প্রগতিশীল এবং অধোগতিশীল করের সমন্বয়ে সামগ্রিক অর্থে একটা প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। আজ আমরা যে ধরনের কর কাঠামোর কথা জোরেসোরে বলি এবং আত্মপ্রসাদে তুষ্ট হই, তাহা কৌটিল্য বহু পূর্বেই সুপারিশ করিয়াছিলেন। অথচ এই সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ, ও কূটনীতিবিদের যথাযথ মূল্যায়ন আমরা করিতে সক্ষম হই নাই। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা অনেক সারবস্তু তাঁহার "অর্থ শাস্ত্র" হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে উহার ঘষামাজা করিয়া নূতন আঙ্গিক ও নূতন নামে (নূতন বোতলে পুরাতন মদের মত) আমাদের সামনে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাহাই আমরা নূতন বিষয় হিসাবে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি।

কৌটিল্যের সময় টোল ঘরে (toll house) পণ্য বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইত। পণ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত হারে কর আরোপ করা হইত এবং ব্যবসায়ীরা উহা প্রদান করিতে বাধ্য ছিল। এক্ষেত্রে কোন অসৎ উপায়ে কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ ছিল খুবই কম। কৌটিল্য টোল ঘরে পণ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে সুপারিশ করেন তাহা দেশে সুষ্ঠুভাবে কর আদায়ের জন্য যে সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে আধুনিক যুগে অনেক দেশে তাহা "bonded warehouse" প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আহরণের চেষ্টা করা হইতেছে। কেননা বর্তমানকালের "bonded warehouse" কৌটিল্যের "টোলঘর" এর মত একই কাজ সম্পাদন করে।

কৌটিল্যের সময় "টোল ঘরে" টোল বা কর প্রদান ছাড়াও ব্যবসায়ীদেরকে রাস্তার ধারে সরকারের নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট মালামালের হিসাব প্রদান করিতে হইত। অর্থাৎ টোলঘরে পেঁছার পূর্বেও ব্যবসায়ীদের মালামালের পরিমাণ ও গুণগতমান পরীক্ষার ব্যবস্থা সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে যে শুল্ক ব্যবসায়ীদেরকে প্রদান করিতে হইত উহা তৎকালীন সময়ে "vartani" নামে পরিচিত ছিল। মালামাল পরীক্ষাও শুল্ক আদায়কারী কর্মকর্তারা "Antapāla" হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পণ্যের বোঝা প্রতি সেই সময়ে এইরূপ শুল্কের পরিমাণ ছিল দেড় পণ [পণ (pan) হইতেছে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত মুদ্রার একক]। এই ধরনের শুল্ক মালামাল ছাড়াও গবাদি পশু চলাচলের উপরও আরোপ করা হইত। সাধারণত গরু বা ঘোড়ার গাড়িতে চাপানো মালামালের উপর যে হারে শুল্ক আরোপ করা হইত, মানুষ কর্তৃক বাহিত মালামালের উপর উহার কম হারে শুল্ক আরোপ করা হইত।

"Antapāla" শ্রেণীর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব শুধু মালামালের "transit" শুল্ক আদায়ের মধ্যেই সীমিত ছিল না, তাঁহারা বিদেশ হইতে আনীত মালামালের প্রকৃতি, পরিমাণ এবং গুণগত মানও পরীক্ষা করিতেন। প্রত্যেক Antapāla তাঁহার নিজস্ব এলাকায় আনীত বিদেশী পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উহাদের জন্য "identity pass" নিজস্ব সীল-মোহরসহ ইস্যু করিতেন এবং তাহার পর মালামালের বহরকে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়কের বরাবর পাঠাইতে বাধ্য থাকিতেন। এই ব্যবস্থা থাকার দরুন কৌটিল্যের সময়ে ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিদেশী পণ্যের চোরাচালান করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল।

এইভাবে বিদেশী পণ্য স্থলপথে আনার সময় উপরিউক্ত "transit" শুল্ক প্রচলিত ছিল। জলপথে যেসব পণ্য

দেশের অভ্যন্তরে আনা হইত উহাদের জন্যও শুল্ক প্রদান করিতে হইত। সাধারণত যে বন্দরে মাল খালাস করা হইত, সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী আমদানিকারকদেরকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত। শুল্ক-তত্ত্বাবধায়ক দেশের প্রচলিত শুল্ক আইন অনুযায়ী আমদানিকৃত নুতন ও পুরাতন দ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপ করিতেন। কৌটিল্যের সময় নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা হইত। এই কারণে অত্যন্ত আবশ্যকীয় না হইলে বিদেশী দ্রব্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হইত। আমদানিকারকরা যাহাতে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে অনুৎসাহিত হয় সেজন্য ঐ ধরনের দ্রব্যের উপর রাষ্ট্রীয় নির্দেশে শুল্ক তত্ত্বাবধায়ক বহু ধরনের কর/শুল্ক আরোপ করিতেন। এই ব্যবস্থা আধুনিক যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য শুল্ক নীতি ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং দেখা যায় সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের একটি অংশ হিসাবে কৌটিল্যের সময় আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শুল্ক নীতিকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হইত। তবে এই শুল্ক নীতি একেবারে শতকরা একশত ভাগ সংরক্ষণমূলক ছিল না। প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির বেলায় খুব কম হারে শুল্ক আরোপ করা হইত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা ছিল নগণ্য। এই ব্যবস্থা অনেকটা আধুনিক যুগে অনুসৃত "কার্যকর শুল্ক হার" (effective rate of protection) নীতির মতই।

অন্যদিকে কৌটিল্য দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত নীতির কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব অনুযায়ী সাধারণত একটা দেশের সেইসব পণ্য বিশেষায়ণ ও রপ্তানি করা উচিত যেগুলি উৎপাদনের বেলায় দেশটির আপেক্ষিক ব্যয়-সুবিধা আছে। কিন্তু আজকাল শুধুমাত্র ব্যয়-সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিচালিত হয় না। কেননা ব্যয়-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপর বিদেশী সরকার কর্তৃক অত্যধিক শুল্ক আরোপ, পণ্যের পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি কারণে একটি দেশের পক্ষে এক বা একাধিক পণ্য লাভজনকভাবে রপ্তানি করা সম্ভব নাও হইতে পারে। রপ্তানীর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে মুনাফা অর্জন করা —অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিময় অর্জন করা। সুতরাং কেউ যদি বর্তমানের আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা তত্ত্বের পরিবর্তে আপেক্ষিক মুনাফার (Comparative Profit) ভিত্তিতে বাণিজ্য কাঠামো ব্যাখ্যার প্রয়াস পান তবে বোধ হয় আপত্তি থাকার কথা নয়। চার হাজার বছর পূর্বে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে কৌটিল্য আপেক্ষিক মুনাফা নীতির সুপারিশ করেন। এই নীতির সুবিধা হইতেছে এই যে মুনাফাই পুঁজিবাদী বা মিশ্র অর্থনীতির মূল নিয়ামক। সুতরাং এক্ষেত্রে মুনাফার ভিত্তিতেই পণ্যের বিশেষায়ণ ও রপ্তানি হওয়া উচিত। কৌটিল্যের ভাষায় বলা যায়: "The Superintendent of commerce will find out (by calculation) whether there is any margin left for profit after making the payment such as toll (sulka), road cess (vartani), conveyance cess, tax payable at military stations, ferry charges, food, fodder and share of the marchants and his followers..."

সুতরাং দেখা যায় কৌটিল্যের সময় বিদেশী পণ্যের উপর দ্বৈত শুল্ক নীতি প্রচলিত ছিল। এইরূপ ব্যবস্থায় কোন ব্যবসায়ী অসাধু পন্থা অবলম্বনের সুযোগ কম পাইত। ফলে সরকারের পক্ষে পণ্যের উপর আরোপকৃত বিভিন্ন শুল্কের সম্পূর্ণ অংশ উঠানো সম্ভব ছিল। আবার তৎকালীন শুল্ক নীতিতে এমন ধারা সংযোজন করা হয় যে রাষ্ট্রের জরুরী আর্থিক অবস্থায় বা যুদ্ধের সময় শুল্ক হার বাড়াইতে পারিবেন। এই ব্যবস্থা তৎকালীন যুগের স্থিতিস্থাপক কর কাঠামোর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
